২০৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 AUG ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

শিক্ষার মুক্তির সংগ্রাম

বেলাল বেগ

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর জন্য ১৯৪৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত কত কমিশন, কত কমিটি হয়েছে তার সন্ধানের জন্যও একটি কমিটি হতে পারে। কমিশন-কমিটিগুলো শত শত ধ্যান-ধারণা উদগীরণ করেছে, বেকার গৃহিণীদের ঘন ঘন ফার্নিচার চেঞ্জের মতো অজস্র ব্যবস্থা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও নতুন সরকার এসে শিক্ষা ব্যবস্থাটার আমূল পরিবর্তনের এসম করেছে। মজার কথা, ঐ কাজটি করার দায়িত্ব যাঁদের দেয়া হয় তাঁরা ইতোপূর্বেই পূর্ববর্তী সরকারের ইচ্ছা পূরণ করেছেন। এভাবে চলে আসার ফলে ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থা সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো আমাদের ঘাড়ে চেপেই বসে আছে।

যে শিক্ষা ব্যবস্থা এখন বলবত আছে তার তুলনা একটি বহু শরিকের পৈতৃক বাড়ি। ওয়ারিশগণ অক্ষমতার জন্য অন্যত্র যেতে না পেরে ইচ্ছামতো যার যার অংশে বেড়া দিয়ে এবং সংস্কার করে বাড়িটাকে উইপোকার ঢিবি বানিয়েছে। ওদিকে যে মূলবাড়িটার খুঁটিগুলোর গোড়া মাটি খেয়ে ফেলেছে সেদিকে কারও খেয়াল নেই। এ সময় আসল কাজটা হলো বাড়িটাকে ভেঙ্গে ফেলা।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে নির্মাণও করা যাচ্ছে না শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম্যে। ঐ ব্যবসায়ীরা পরীক্ষা নামক এমন এক ব্যবসায় চালু রেখেছে যে, গোটা সমাজ তা থেকে নিষ্কৃতি লাভের ইচ্ছা ও শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে, ডিগ্রী-ডিপ্লোমার প্রসাদ বিতরণ হচ্ছে। ফলাফলে জীবন মুক্ত হচ্ছে না, পশ্চাদপদতা জমে জমে অচলাবস্থা আরও স্থায়ী হচ্ছে। সাধারণ মানুষ কিন্তু বসে নেই। তারা নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করে নিচ্ছে। কারণ শিক্ষা ছাড়া মানবজীবন সম্ভব নয়। বাঘ যেমন নিজের বাচ্চাগুলোকে শিকার করতে শেখায় সাধারণ মানুষও আপন আপন সন্তানকে নিজের বিদ্যাটা শিখিয়ে দেয়। সে জন্য জেলের ছেলেটা জেলে হচ্ছে, কারিগরের ছেলেটা কারিগর হচ্ছে। বিদেশে কি কি কাজ জানলে সুবিধা হয় তাও জেনে গেছে সাধারণ মানুষ। তারা নিজেরাই স্কুল খুলেছে। সে সব স্কুলে সাধারণ মানুষের ছেলে-পুলেরা ওয়েল্ডিং, ড্রাইভিং, কার্পেন্টারি প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা পাচ্ছে।

সাধারণ মানুষের বিদ্যা-শিক্ষার লক্ষ্য নিহায়েত ক্ষুন্নিবৃত্তি, বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এর সঙ্গে মানুষ হবার মহৎ ধ্যান-ধারণাগুলোর সম্পর্ক নেই। মানুষের প্রত্যাশা ছিল তাদের রাষ্ট্র ঐ দায়িত্বটা নিয়ে তাদের সন্তানদের উন্নত ও কর্মী মানুষ হিসাবে গড়ে দেবে। কিন্তু রাষ্ট্র ও সরকার তাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেনি। তাই তারাও স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কি হয় না হয় তার সন্ধান করেনি, যদিও তারা নেতাদের সাথে মিছিলে গেছে। দাবি করেছে তাদের এলাকার স্কুলকে কলেজ, কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় বানাতে হবে। শিক্ষার সঙ্গে জনস্বার্থের বিচ্ছিন্নতা বহাল রেখেছে জনকল্যাণ বিমুখ রাজনীতি। স্বাধীনতাউত্তর বঙ্গবন্ধুর সরকার নতুন দেশ, নতুন সমাজের চালিকা শক্তি হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে দেশ মাতৃকার এক শ্রেষ্ঠ সন্তান ডঃ কুদরত-ই-খুদাকে প্রধান করে একটি কমিশন নিয়োগ করেছিল। সে কমিশন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি রূপরেখাও প্রণয়ন করেছিল। কিন্তু বাঙালী জাতির শত্রুগণ জাতির মহানায়ক এবং তাঁর সহকর্মীদের হত্যা করে ইতিহাসের চাকা পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। গত ২১ বছর রাজত্বকারী শাসক গোষ্ঠীগুলোর পতাকা ও সাইনবোর্ড ভিন্ন ভিন্ন হলেও জনগণকে তাদের, রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও জাতিগত স্বপ্ন থেকে দূরে সরিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তারা একটা গোলক ধাঁধা বানিয়ে জনগণকে তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। জনগণ মহানন্দে পথ খুঁজতে গিয়ে পথ ভুলতে থাকে। এ সুযোগে শাসক শ্রেণী নিজেদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। বিত্তবান শাসক শ্রেণীর সন্তানেরা কিন্ডারগার্টেন, পাবলিক স্কুল, ক্যাডেট কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজে উপযুক্ত পরিবেশে যথার্থ শিক্ষা পেয়ে চলেছে। ঐ একই সময়ে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা লক্ষ্যহীন বেওয়ারিশ পরিবেশে হানাহানি করে মরছে। শাসক শ্রেণী ঠিক এ ব্যবস্থাটিই চায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চক্ষুষ্মান প্রজন্ম জেগে উঠলে শাসক শ্রেণীর লুণ্ঠন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। তারা তা হতে দেবে না। নিজের শ্রেণী শাসন কায়েম রাখার স্বার্থেই তারা শিক্ষাঙ্গনে নিজের অনুগত ছাত্র-বাহিনী রাখে। ছাত্র বাহিনীগুলো ছাত্র রাজনীতির নামে আসলে শাসকগোষ্ঠীগুলোকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখে। শিক্ষকদের একটা বিরাট অংশও ঐ প্রক্রিয়ার সঙ্গে একই উদ্দেশ্যে জড়িত থাকে। বিগত ২১ বছরে শিক্ষাঙ্গনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি ও লালন হয়েছে তাতে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালী জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-সাধ, গৌরব-অহঙ্কারের কোন পরিবেশ রাখা হয়নি। এমনকি সাধারণ মানুষের ছেলেরা একটা সামান্য জীবিকার জন্যও প্রয়োজনীয় শিক্ষা পায় না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থহীন, বন্ধ্যা ও বিভ্রান্তিকর রাখার পিছনে যে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র কাজ করে চলেছে মানুষ তা বোঝে না। বোঝে না বলেই গরু-মোষের পালের মতো সন্তানদের স্কুল-কলেজে ঠেলে পাঠায়। সাধারণ ছেলেমেয়েরা ঘটা করে মেট্রিক, আইএ, বিএ, এমএ, এমএসসি পাস করে দলে দলে অকর্মণ্য, অপদার্থ বেকার হয়।

> নতুন শিক্ষা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক মূল্যবোধগুলোর নবজন্ম দেবে। তাতে ছাত্র-শিক্ষক, পণ্ডিত- গবেষক, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক সকলে আলোক-স্নাত হবেন। এমন অবস্থা হলে সমাজে তার বিকিরণ হবে। স্বাধীনতা সার্থক হবে। স্বাধীনতার সংগ্রামীগণ এখন ক্ষমতায় থাকায় জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায় নীতি এবং নৈতিকতার মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময় এসেছে।

১০৬টি কানুনগোর চাকরির জন্য ৫০ বস্তা দরখাস্ত জমা হয়, দু'এক হাজার প্রাথমিক শিক্ষক পদের জন্য ১ লাখ শিক্ষিত বেকার হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

গত ২১ বছর রাষ্ট্র ও সরকার যদি জনগণের হতো তাহলে এক কোটি শিক্ষিত বেকার তৈরির অমানবিক এবং হৃদয়হীন ঘটনা ঘটত না। জনগণের সরকার শিক্ষাকে সৃজনশীলতা বিকাশের এ্যাটমিক রিএ্যাক্টর বানায়। জনগণের প্রকৃত শিক্ষা মন্দিরে শিক্ষা কেবল পরীক্ষা পাস বা ডিগ্রী লাভ নয়, এটি সচল জীবন প্রবাহের একটি স্বাভাবিক তেজোদ্দীপ্ত আনন্দ ধারা।

শিক্ষা মানেই জীবন এবং ক্রমাগত উন্নত জীবনের অবিরাম সংগ্রাম। এ লক্ষ্যেই শিক্ষার সকল আয়োজনের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এ জাতিকে নতুনভাবে আত্মশক্তি সন্ধানের এবং আত্মনির্ভরতার শিক্ষা দিতে হবে। সসম্মানে পুনর্বাসিত করতে হবে প্রত্যেক নাগরিককে তার কাঙ্ক্ষিত জীবন কক্ষপথে। আমাদের শিক্ষা সংস্কারের অতীত প্রয়াসগুলোতে দেখা গেছে উদ্যোক্তাদের প্রধান দৃষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থাপনার ওপর নিবদ্ধ থাকে। শিক্ষাখাতে বাজেট ব্যয়, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা, স্কুল-কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি মোটা দাগের বিষয় কমিশন সদস্যদের মেয়াদ খেয়ে ফেলে। ফলে শিক্ষার দর্শনগত প্রয়োগ এবং এর অন্তর্গত বিষয়গুলোর মানোন্নয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট সময় দেয়া যায় না।

আমাদের দেশটি গরিব। আমাদের সম্পদ সীমিত। চাটাইয়ে শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা আমাদের পোষাবে না। আমাদের শিক্ষা সংস্কারে তাই শিক্ষা-ব্যবস্থাপনার স্থূল বিষয়গুলো, যেমন বেতন-ভাতা, দালান-কোঠা, টুল-চেয়ার প্রভৃতি যেন প্রাধান্য না পায়। কমিশনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষাকে ঔপনিবেশিকতা এবং বন্ধ্যাত্ব থেকে মুক্তি দেয়া। কমিশন শিক্ষক, কারিকুলাম প্রণেতা, শিক্ষা-প্রশাসকদের এমনভাবে উদ্দীপ্ত করবে যে তাঁরা যেন বর্তমান প্রজন্মকে একবিংশ শতাব্দীর সমস্ত চ্যালেঞ্জের জন্য শারীরিক-মানসিকভাবে প্রস্তুত করার নেতৃত্ব দিতে পারেন। বলা বাহুল্য, আমাদের শিক্ষার প্রধান শৃঙ্খল কতকগুলো অর্থহীন পাবলিক পরীক্ষা। এসব পরীক্ষা ব্যয়বহুল এবং ত্রুটি ও দুর্নীতিযুক্ত। এগুলো থেকে মুক্তির উপায় জাতীয় মান নির্ধারক কিছু 'স্ট্যান্ডারাইজড' পরীক্ষা উদ্ভাবন। আমরা আমেরিকার স্যাট, জিইডি প্রভৃতি পরীক্ষা এবং ওগুলোর ব্যবস্থাপনা থেকে শিক্ষা নিতে পারি।

ধর্মীয় শিক্ষার নামে, সেনাবাহিনীর জন্য চৌকস জনশক্তি তৈরির অজুহাতে, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির দোহাই দিয়ে 'কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা, ক্যাডেট কলেজ প্রভৃতির জন্য হওয়ায় আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটি প্রাতিষ্ঠানিক অরণ্যে রূপ নিয়েছে। এ সব প্রতিষ্ঠান আমাদের 'এক দেশ এক জাতি'কে মানসিকভাবে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। বহুমাত্রিকতার নামে বিভেদ সৃষ্টিকারী এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে মূল ব্যবস্থার ভিতর একাত্ম করে দিতে হবে। শিক্ষা সংস্কারের একটি প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শিক্ষকদের তাঁদের পেশার মহত্ত্বে পুনরাভিষেক ঘটানো। এ জন্য তাঁদের টনক নড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষাকে একটি জাতীয় জরুরী সার্ভিস হিসাবে ঘোষণা দিয়ে নিয়ম করা উচিত প্রতি পাঁচ বছর পর তাদের শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হবে।

শিক্ষার মুক্তি হতে হবে শিক্ষাঙ্গনের বাইরেও। সমাজে এককালে ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতো ধর্মীয় মূল্যবোধ দিয়ে। তখন ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, এসিড নিক্ষেপ, শত্রুতার জন্য হত্যা, মিথ্যা বলা, প্রতারণা, ওজনের কারচুপি, ভেজাল প্রভৃতি অপরাধ প্রায় অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু এখন আমাদের সমাজকে অপরাধ প্রবণ বলে চিহ্নিত করা যায়। এখন ক্ষমতা দখল, ব্যবসা-বাণিজ্য দখল, অর্থলাভ, যৌন লিপ্সা প্রভৃতি যে কোন স্বার্থে প্রায় যে কোন ব্যক্তি যে কোন অপরাধ করছে এবং পারও পেয়ে যাচ্ছে একই কারণে। সমাজে ব্যাপক অপরাধ প্রবণতার শুরুটা হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে। স্বাধীনতাবিরোধী একটা বড় শক্তির হাতে অস্ত্র রয়ে যায়। ক্ষমতাসীন সরকারগুলো শক্ত হাতে সমাজের সর্বস্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে আইন ও ন্যায় নীতির শাসন প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে হিংসা-প্রতিহিংসা, ঘাত-প্রতিঘাত, অস্ত্র-অর্থ-ক্ষমতার রাজত্ব সমাজের নিয়মে পরিণত হয়। এখন সভ্য জীবনের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান কলঙ্কিত কিংবা নষ্ট পর্যায়ে আছে। বাঙালীর নিজস্ব সভ্যতার মূল্যবোধগুলো সেই যে স্বাধীনতাউত্তরকালে উধাও হয়েছে সমাজে তাদের পুনর্বাসনের আর কোন চেষ্টা নেয়া হয়নি। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণকারীগণ সমাজে কোন আদর্শ তৈরি করতে পারেননি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব মূল্যবোধের জন্য মায়াকান্না কেঁদেছেন কিন্তু নির্বাচনকালে ন্যক্কারজনকভাবে তাদের পদদলিত করেছেন।

নতুন শিক্ষা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক মূল্যবোধগুলোর নবজন্ম দেবে। তাতে ছাত্র-শিক্ষক, পণ্ডিত- গবেষক, শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক সকলে আলোক-স্নাত হবেন। এমন অবস্থা হলে সমাজে তার বিকিরণ হবে। স্বাধীনতা স্বার্থক হবে। স্বাধীনতার সংগ্রামীগণ এখন ক্ষমতায় থাকায় জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, ন্যায় নীতি এবং নৈতিকতার মূল্যবোধগুলো প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সময় এসেছে। 'এবারের সংগ্রাম দেশ গড়ার সংগ্রাম' বলা হয়েছে। শিক্ষা-সংস্কারের বিষয়গুলো নিষ্পত্তি হলে সেগুলো সার্থক করার জন্য ছাত্র-শিক্ষক-পণ্ডিত গবেষকদের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত।